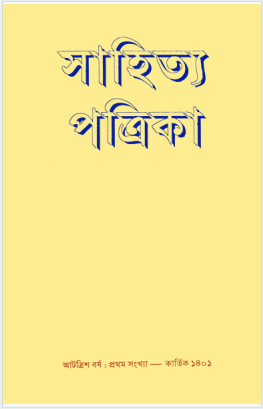

Vol. 38 | No. 1 | 1994

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে খাদ্য-পানীয়

Volume	38
Issue	1
Year	1994
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	নরেন বিশ্বাস
Published online	October 1, 1994
DOI	10.62328/sp.v38i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v38i1.4
Pages	51-73
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৮ : সংখ্যা ১

Check for updates

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে খাদ্য-পানীয়

নরেন বিশ্বাস

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালির খাদ্য ও পানীয়ের বিবরণ ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, মৈমনসিংহ গীতিকা, ইউসুফ জোলেখা, নবীবংশ, গুলে বাকাউলি ও অন্নদামঙ্গল অবলম্বনে এ-নিবন্ধে বাঙালির খাদ্য-পানীয়ের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বাঙালির খাদ্যাভাসে হাজার বছরের বিবর্তনের চিহ্নও পাওয়া যাবে এর বিশ্লেষণে।।

অধ্যাপক, বাংলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এক : প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রনাথ একদা খেদে বলেছিলেন :

> ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নকাহিনীমাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলেয় ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, একদল যদি বা যায় কোথা হইতে আর একদল উঠিয়া পড়ে —পাঠান-মোগল পর্তুগীজ-ফরাসী-ইংরাজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৭২ : ৩৭৭-৭৮]

প্রথম শ্রবণে অনেকের মনে হতে পারে এটা নিশ্চয়ই বিশ্বকবির কল্পনা প্রসূন 'ভাবেভরা অর্থহারা' কথা কিংবা খেয়ালি উক্তি। কিন্তু কোনো বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী গবেষক যদি আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধানে ব্রতী হন তিনি অল্পায়াসেই উপলব্ধি করতে পারবেন ইতিহাস নামে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে আমরা যা অধ্যয়ন করি তার সঙ্গে এ-দেশের মাটি এবং মানুষের সম্পর্ক আবিষ্কার করা এক দুরূহ ব্যাপার। কারণ সে ইতিহাস তো রাজা-বাদশা, নবাব-জমিদার বা সামন্তপ্রভুদের ইতিহাস; তাদের জয়-পরাজয়, শাসন-শোষণ, হারেম-দরবারের আলোকোজ্জ্বল বর্ণনা। এ-ইতিহাসে আমাদের লাভ কী ? যেখানে নেই এ-দেশের গ্রাম-বাংলার মানুষের সামাজিক আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন-চর্যার সামান্যতম পরিচয়ও।

দেশী-বিদেশী বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গ জাতি হিসাবে আমাদেরকে যেভাবেই চিহ্নিত করুন না কেন, এ কথা তো অনস্বীকার্য, আমরা দীর্ঘকাল অর্থাৎ শতাব্দের পর শতাব্দ ধরে বিদেশী শাসকদের দ্বারা শাসিত এবং শোষিত হয়েছি। আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-দর্শন, ধর্মনীতি সমাজনীতি, রাজনীতি অর্থনীতি, এমনকি জাতিসত্তার বৈশেষিক লক্ষণসমূহও বিজ্ঞাপিত হয়েছে তাদের প্রদত্ত অভিজ্ঞানপত্রের আলোকে। ফলে প্রকৃততথ্য উদঘাটন অসাধ্য না হলেও হয়ে উঠেছে দুঃসাধ্য।

এ-ক্ষেত্রে হাজার বছরের পুরোনো চর্যাপদ থেকে অর্থাৎ বাংলা কাব্যসাহিত্যের আদি নিদর্শন থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত নিত্য বহমান যে সৃষ্টিকর্ম, বিকল্পবিহীনভাবে কেবল তার মধ্যে খুঁজতে হবে আমাদের ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া অধ্যায়কে, জীবনের ও যুগের বহুমাত্রিক সমাচারকে।

বর্তমান নিবন্ধে আমরা ব্যাপককালের বিপুল সাহিত্যভাণ্ডার মন্থন করে ইতিহাসের বহুবর্ণিল সমাচার বা বিচিত্রবিষয়ের তথ্য সরবরাহে ব্রতী হবো না।

আমরা এখানে আমাদের প্রস্তাবনা অনুসারে কেবল প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে বর্ণিত খাদ্য ও পানীয় বিষয়ক কিছু 'সন্দেশ' প্রদানে যত্নবান হবো। আমরা এতোদিন কাব্যসাহিত্যে কেবল, রসতত্ত্বের সন্ধান করেছি, রসনাতত্ত্ব উপেক্ষিত থেকে গেছে বরাবর। নিবন্ধের প্রস্তাবনাকে আর প্রলম্বিত না করে আমরা এবারে কাহ্নপা থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত অর্থাৎ সপ্তম-অষ্টম শতাব্দ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দের প্রথমার্ধ পর্যন্ত কতিপয় বিখ্যাত কাব্যে বর্ণিত বাঙালি জাতির ভোজন-উপকরণের বিবরণ দিতে চেষ্টা করবো। আমাদের নির্বাচিত এলাকা হবে: (ক) *চর্যাপদ* (খ) *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* (গ) মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল (ঘ) *মৈমনসিংহ গীতিকা, ইউসুফ জোলেখা, নবীবংশ, গুলে বাকাউলি* ইত্যাদি এবং (ঙ) ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল*।

দুই : চর্যাপদ

বাংলা কাব্যের আদিতম নিদর্শন চর্যাপদ। আবিষ্কর্তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপাল রাজদরবার গ্রন্থশালা হতে উদ্ধার করে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ থেকে *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা-* নামে প্রকাশ করেন। মোট ছাব্বিশ জন সিদ্ধাচার্য বা কবির রচনা পাওয়া যায় চর্যাপদে। এর রচনাকাল ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে সপ্তম শতাব্দ থেকে শুরু; অন্যদিকে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী এঁদের ধারণা দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে এগুলো লেখা। এর ভাষাকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অভিহিত করেছেন: " ... সন্ধ্যাভাষা ...। সন্ধ্যা ভাষার মানে, আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না। [হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩২৩: (৮)]। অর্থাৎ সে যুগের সিদ্ধাচার্যগণ বৌদ্ধধর্মের নির্বাণতত্ত্বের কথা সাধারণ মানুষের কাছে প্রচারের জন্যে জনজীবনে প্রচলিত ভাষায় রূপক সাঙ্কেতিকতার আশ্রয়ে রচনা করেছিলেন এ-পদাবলি। কিন্তু এ-রূপক ও ধর্মতত্ত্বের আবরণ ভেদ করে আমাদের কাছে ধরা পড়ে সেদিনের অবহেলিত মানুষের মর্মের সমাচার, জীবনযাত্রার বহুবিধ বিশ্বস্ত চিত্র। ডক্টর সুকুমার সেনের ভাষ্যে:

> চর্যাগীতিতে, বিশেষ করিয়া সন্ধ্যাভাষিত চর্যাগীতিগুলিতে, সমসাময়িক তুচ্ছ নীচ সাধারণ জীবনের যে সত্য ছবি উঠিয়াছে তাহার তুলনা কোথাও নাই। এই চর্যাগীতিগুলিতে যে জীবনচিত্র ক্ষণোদ্ভাসিত তাহা দেবী-দেবার নয়, রাজা-উজীরের নয়, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের নয়, ব্যাধ-বণিকেরও নয়। ইহাতে সাহিত্যের রীতিসিদ্ধ গতানুগতিক কারবার নাই। কোনরকম অতিশয়োক্তি নাই। সেকালে অখ্যাত অজ্ঞাত অতি সাধারণ লোকের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ও আচরণের বিম্বপ্রায় খণ্ড খণ্ড প্রতিরূপ থাকায় গানগুলি জীবনরসিক ঐতিহাসিকের কাছে মূল্যবান হইয়াছে। [সুকুমার সেন ১৯৭৩:৩২-৩৩]।

আমরা 'জীবনরসিক ঐতিহাসিক'-এর সর্বব্যাপী কৌতূহল নিয়ে নয়, খাদ্যরসিক বাঙালির লোভাতুর দৃষ্টিতে প্রাগুক্ত সৃষ্টি সমীক্ষায় ব্রতী হবো। খাদ্যবিষয়ক সমাচার সংগ্রহে প্রথমেই অন্নের খরবই জানা দরকার চর্যাপদে ভাতের কথা সরাসরি পাওয়া যায় ৩৩ নং চর্যায়, কবি ঢেণ্টণ পা যে বিবরণ দিয়েছেন তা কিন্তু খুবই বেদনাদায়ক:

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।।

-অর্থাৎ টিলার উপরে আমার ঘর, কোন প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই (অথচ) প্রতিদিন অতিথি আসছে।[১]

এবার চর্যাপদসমূহ অবলম্বনে খুঁজে বের করবো অন্যান্য খাদ্যবস্তু, যা ছিল সেদিনের শ্রমজীবী মানুষের নিত্য আহার্য।

মাংসার্থী ব্যাধের হরিণ-শিকারের উৎপ্রেক্ষায় উল্লিখিত হয়েছে মাংসের কথা:

জীবন্তে ভেলা বিহণি মএল ণঅণি।
হণবিণু মাঁসে ভূসুকু পদ্মবণ পইসহিণি।।
[চর্যা - ২৩]

-অর্থাৎ জীবন্ত থাকা বিনে মৃত বা মরাই নিলাম (?) হত্যা বা নিধন ব্যতিরেকে আমি ভুসুকু পদ্মবনে প্রবেশ করলাম।

এ-পদকর্তা শিকারের বর্ণনায় ভিন্ন স্থানে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় মাংসের কথাটি স্মরণ করেছেন এভাবে:

আপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরী।।
[চর্যা - ৬]

-নিজের মাংসে হরিণ (নিজের) শত্রু। ক্ষণকালের জন্যে শিকারী ভুসুকু শিকার ছাড়ে না। এখানে 'মাংসেঁ'—অর্থ মাংস দ্বারা বা হেতু (সংস্কৃত-মাংসেন, হেত্বার্থে-তৃতীয়া বা করণ কারক)।

বাইরের শোষণ-নির্যাতন ভোলার জন্য, প্রতিকারহীন অত্যাচার বিস্মরণের বিকল্প হিসেবে, সহজিয়া সাধনার অনুষঙ্গরূপে বারংবার চর্যাপদের কবিরা রূপকের আশ্রয়ে বর্ণনা করেছেন বিচিত্র ধরনের দেশজ মদের কথা:

এক সে শুণ্ডিনিণা দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ।।
[বিরুবাপাদানাং ; চর্যা - ৩]

- এক যে শুঁড়ি বৌ বা রমণী দুঘরে ঢুকে চিয়ানো-বাকড় মদ বাঁধে।

চর্যাপদের সর্বাধিক পদ-রচয়িতা কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নপা'র বর্ণনায় কেবল মদ-তৈরির কথা নয়, একেবারে মাতাল হওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়:

কাহ্ন বিলসঅ আসবমাতা।
সহজ নলিনীবণ পইসি নিবিতা।।
[চর্যা - ৯]

-কাহ্ন মদমত্ত হয়ে বিলাস করে। সহজরূপ নলিনী বা পদ্মবনে প্রবেশ করে তবে সে শান্ত (হয়)।

নগরের ধনিক-বণিক অভিজাত-মানুষের নিরন্তর উপক্ষোয় অবহেলিত যাদের জীবন, সেই সব শবর-ব্যাধ, ধীবর-কৈবর্ত, তাঁতী-ডোম-মাঝি ধুনুরী ইত্যাদি অন্ত্যজ শ্রেণির শ্রমজীবী মানুষেরা অবারিত প্রকৃতির অকৃপণ দানে বঞ্চিত জীবনের সঞ্চিত ক্ষোভ বা দুঃখ ভুলতে চেয়েছে:

কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা।
অণুদিণ শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভেলা।।
[শবরপাদানাং; চর্যা ৫০]

অর্থাৎ কঙ্গুচিনা পাকলো। ওরে শবর-শবরী মেতেছে। দিনের পর দিন শবরের আর কিছু হুশ নেই, সে মহাসুখে মগ্ন বা মশগুল।

এখানে কঙ্গুচিনা মানে কাংনিদানা বা কাগনিধান, একধরনের শস্যবীজ।

কেবল মদ-মাংসের কথাই বর্ণিত হয় নি চর্যাপদে, কখনও রূপকে কখনও বা উপমা-উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে সাঙ্কেতিকতার সরণীধরে ভোজন রসিক বাঙালির নানাবিধ

খাদ্যদ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায় সেখানে। এর মধ্যে লাউ, তেঁতুল, দুধ-ননী-মাখন থেকে শুরু করে তাম্বুল কর্পূর পদ্ম-মৃণাল এবং কল্পিত অমৃতও বাদ পড়ে নি:

সূঅ লাউ সসি লাগেলি তান্তী
অণহা দাণ্ডী চাকি কিঅত অবধূতী।।
[বীনপাদানাং ; চর্যা - ১৭]

-সূর্য লাউ, তাঁত হলো চাঁদ, অনাহত দণ্ড এবং চাকতি করা হচ্ছে অবধূতীকে।

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
বুখের তেন্তুলি কুম্ভীরে খাঅ।।
[কুক্কুরীপাদানাং ; চর্যা - ২]

পণ্ডিতজন একে আখ্যায়িত করেছেন 'নিষ্প্রপঞ্চ চর্যা'—নামে। অর্থাৎ অসম্ভব ঘটনামূলক প্রহেলিকা পরম্পরায় এটি রচিত। যেমন এখানে মাদী কাছিম দোয়ানো হলো, পাত্রে দুধ আর ধরে না। গাছের তেঁতুল কুমিরে খায়। আজগুবি ব্যাপার বটে, তবে এতে তেঁতুল খাওয়ার খবরটা কিন্তু প্রপঞ্চ বা মিথ্যে হয়ে যায় না।

বেঙ্গ সংসার বড়হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেন্টে যামাঅ।।
[ঢেণ্ঢন পাদানাং ; চর্যা - ৩৩]

-ব্যাঙের মতো সংসার বা পোষ্য (কেবল) বেড়েই যায়, আর কি আশ্চর্য দোয়ানো দুধ কি আবার বাটে ফিরে যায় !

দরিদ্রের সংসারে অবস্থা বিপাকে এমনি ঘটে থাকে।

মূঢ়া অচ্ছন্তে লোঅ ণ পেখই।
দুধ মাঝেঁ নড়ণ চ্ছন্তে [না] দেখই।।
[কাহ্নপাদানাং; চর্যা- ৪২]

-মূঢ় বা অজ্ঞান হলে কোনো লোক (সত্য) দেখে না। যেমন দুধের মধ্যে ননী থাকলেও তা দেখা যায় না।

হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই।।
[শবরপাদানাং ; চর্যা - ২৮]

এখানে ' তাম্বুল' কর্পূরের উল্লেখ পাওয়া গেল।

সরবর ভাঞ্জীঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ।
মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ।।
[কাহ্নপাদানাং ; চর্যা - ১০]

-ডোমনী সরোবর (থেকে) ভেঙ্গে মৃণাল খাও ; আমি ডোমনীকে মারি, তার প্রাণ নেই (আর)।

ভুসুকু পা-র মূষিক চর্যা থেকে অমৃত ভক্ষণের সমাচার:

নিসিঅ অন্ধারী মুসার চারা।
অমিঅ ভখঅ মুসা করঅ আহারা।।
[ভুসুকুপাদানাং ; চর্যা - ২৯]

-অন্ধকার রাত্রিতে মূষিকের আহার বা খাদ্য অন্বেষণ। ইঁদুর অমৃত (অর্থাৎ দুর্লভ খাদ্য) খায় এবং (তো) জড়ো করে।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, রাহুল সাংকৃত্যায়ন-আবিষ্কৃত চর্যাগানে (২ নং) 'মাচ্ছ' বা 'মাচ্ছা' অর্থাৎ বাঙালির অতিপ্রিয় মাছের উল্লেখ আছে [সুকুমার সেন ১৯৭৩ : ২১২]।

তিন: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

প্রাক চৈতন্যযুগের রাধাকৃষ্ণের প্রণয় উপখ্যান অবলম্বনে রচিত বড়ুচণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্য। আবিষ্কারক এবং সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ. এর রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতের মধ্যে বিতর্ক বর্তমান। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনতম লিপি সম্ভবত ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের [মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯-: ৪৯]।

বড়ুচণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের ভাবাকাশ সম্পূর্ণ মানবিক। গ্রামীণ গোপ-জীবনভিত্তিক কাব্য বলে এখানে দুধ-দই, ননী-মাখন কিংবা ঘতের বিবরণ দেওয়া

অনাবশ্যক। গোয়ালা রমণীর দুগ্ধজাত পসরা নিয়ে হাটে যাওয়ার কিংবা প্রেমার্থে ঘাটে যাওয়ার বর্ণনাও এখানে জরুরি নয়। আমরা তের খণ্ডে বিভক্ত বিশাল কাব্যে রাধাকৃষ্ণ প্রেমে মশগুল হতে চাই নে, শ্রীমতী রাধার রন্ধনশালায় প্রবেশ করে, রন্ধন-উপকরণের নির্ভুল খবর সংগ্রহ করতে চাই। স্বামী আইহনের জন্য রাধা রাঁধা শুরু করেছেন; শাক-ভাত, ঝোল-অম্বল রান্নায় তার সুনাম ছিল বরাবর। কিন্তু আজ বংশীধ্বনি তার রন্ধনকে এলোমেলো করে দিচ্ছে 'বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন।।' উতলা রাধা আজ পদে পদে ভুল করছে:

সুসর বাঁশীর নাদ শুণিআঁ বড়ায়ি
রান্ধিলোঁ যে সুনহ কাহিনী।
আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ
সাকে দিলোঁ কানাসোআঁ পানী।।
রান্ধনের জুতী হারায়িলোঁ বড়ায়ি
সুণিআঁ বাঁশীর নাদে।।
নান্দের নান্দন কাহ্ন আড়বাঁশী বাএ
যেন রএ পাঞ্জারের শুআ।
তা সুণিআঁ ঘৃতে মো পরলা বুলিআঁ
ভাজিলোঁ এ কাঁচা গুআ।।
সেই ত বাঁশীর নাদ সুণিআঁ বড়ায়ি
চিত্ত মোর ভৈল আকুল।
ছোলঙ্গ চিপিআঁ নিমঝোলে খেপিলোঁ
বিণি জলে চড়াইলোঁ চাউল।।
[অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ১৯৭৫:২৭৬-৭৭]

-অর্থাৎ রাধা বড়াইকে বলছে ; সুমধুর বংশীধ্বনি শুনে যে রান্না আমি রেঁধেছি সে কাহিনী শোন। অম্বল-ব্যঞ্জনে দিলাম ঝালমসলা আর শাকের হাঁড়িতে জল দিলাম কানা ভর্তি করে। বাঁশির শব্দে রান্নায় আনন্দ বা যুত পাচ্ছি নে, নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ যে আড়বাঁশি বাজায় তার সুর শুনলে মনে হয় যেন পাঁজরের শুকপাখি গান গাইছে। আর তা শুনে, এই দেখ, ঘিয়ে পটোল বলে কাঁচা সুপারি ভেজে ফেলেছি। বাঁশির শব্দ শুনে আমার মন এতোটা ব্যাকুল হয়েছে যে, ভুল করে তিঁতা বা নিমঝোলে আমি নিংড়ে দিয়েছি লেবুর রস আর হাঁড়িতে জল না দিয়েই চড়িয়েছি ভাত রান্নার চাল।

এখানে প্রেম-বিহ্বলা রাধার রাঁধার অসঙ্গতি যতোই প্রবল হোক না কেন, আমরা কিন্তু এর মাধ্যমে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দের গ্রাম্য মানুষের একটা নৈমিত্তিক খাদ্যতালিকা উদ্ধার করতে পারি এবং বুঝতে পারি কোন খাদ্য-দ্রব্যের সঙ্গে কোন বস্তুর মিশ্রণে সুখাদ্য-অখাদ্যে পরিণত হয়।

চার:মনসামঙ্গল

পনের শতক থেকে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান কবি কানাহরি দত্ত, নারায়ণ দেব, কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ, বিজয়গুপ্ত এবং বিপ্রদাস পিপলাই। শুধু মনসামঙ্গল নয়, পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দ পর্যন্ত এ-চারশত বৎসরে তাবৎ মঙ্গলকাব্যে যে-সব দেবদেবীর চরিত্র বর্ণিত হয়েছে তার সঙ্গে ধর্মীয় দার্শনিকতা কিংবা আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। এরা অনার্যকুলজাত মনুষ্যলক্ষণে অঙ্কিত। এদের হিংসা, দ্বেষ, লোভ-লালসা, দুঃখ-দারিদ্র্যে দেবত্বের কোনো ছাপ নেই, পূর্ণভাবে মানবজীবনরসে পুষ্ট। মনসামঙ্গলের কবি বিজয়গুপ্তের কাব্যে বিশ্বস্তভাবে বর্ণিত হয়েছে বরিশাল অঞ্চলের লোকজ জীবনের অন্তরঙ্গ চিত্র। ভোজনরসিক বরিশালবাসী কবির অভিজাত খাদ্যতালিকার বিস্তারিত বিবরণ প্রদানের আগে সোনকার সাধ-ভক্ষণে উল্লিখিত কতিপয় শাকের উল্লেখ করছি :

শাক তুলিতে যায়ে ধাই চেড়ি।
বাহু লাড়া দিয়া ফিরে বাড়ি বাড়ি।।
. . . .
নাচে ধাই দিয়া বাহু লাড়া।
শাক তুলিতে পড়িয়া গেল সাড়া।।
ধাই ফিরে দিয়া কাকালি হাতা।
গাছি শাক দেও লতা পাতা।।
সাধের শাক খাইব রাণী।
আনিবা তুয়া সলুফা ঠেনঠেনি।।
গিমা গাঙ্গড়াইয়া তোলে আর নালিতা।
মধুলতা খাইয়া আর পোলতা।।
লাউর ভাঙ্গে আগা কুমরের ভাঙ্গে ডোগা।
বাছিয়া বাছিয়া তোলে শাক ঢোল কমলির আগা।।
ঢুলুয়া লটীয়া তোলে আর সরূপা।
মরিচের আগে তোলে রান্দনি ধনিয়া।।
[জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত ১৯৬২: ২৯৬-৯৭]

বিজয়গুপ্তের পুথির পাঠান্তরে পাওয়া যায় সোনকার সাধ ভক্ষণের জন্যে আরও কয়েক ধরনের শাকের উল্লেখ,—"ওকড়া, বাথুয়া থানকুনি" " ..... গেনারি ঘিনালিতা। তেলকুচা খাসিয়া পোলতা।" এবং 'নাটুয়ার ফণা' ইত্যাদি। এতো গেল গর্ভবতী নারীর দোহদ সমাচার, এরপরে কবি বর্ণনা করেছেন চাঁদ সওদাগর পত্নীর প্রস্তুত উপাদেয় খাদ্যসামগ্রীর:

স্নান করিয়া সোনাই চড়াইল রন্ধন।
নিরামিষ আমিষ রান্ধে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।।
নানা দ্রব্য উপহার কিছু দুঃখ নাই।
রন্ধনের দ্রব্য যত থুইল ঠাই ঠাই।।
আগে পূজিল অগ্নি ধূপ দীপ দিয়া।
চড়াইল, রন্ধন রাণী হরষিত হইয়া।।
তেতইলের কাষ্ঠে অগ্নি করে ধুক ধুক।
নারিকেল খাড় দুগ্ধে রান্ধে মুগসুগ।।
শাক সুকুতা রান্ধে কলইর ভাঙ্গে বড়া।
কটু তৈল দিয়া ভাজে তাল বাইয়ন পোড়া।।
রান্ধন রান্ধিতে সোনাইর দ্বারে বাজে শিঙ্গা।
নারিকেল দিয়া রান্ধিলেক ঝিঙ্গা।।
লতাপাতা সর্ব্ব শাক করে ফেচ ফেচা।
নারিকেল ঘৃত দিল আর আদা ছেচা।।
বাইগন সলুফা অতি দেখিতে শোভন।
তাহা দিয়া রান্ধিলেক সুকত পাচন।।
রন্ধন রান্ধিয়া সোনাই ভরে বাটী বাটী।
ঢেকির কড়ি দিয়া রান্ধে কাঁঠাল আটি।।
খেসারির ডাইল রান্ধে কাঁঠালের মুছি।।
দুগ্ধ লাউ দিয়া রান্ধে খাড়লা মুছি।
রন্ধন রান্ধিয়া সোনাই করিল ভাগ ভাগ।
হিঙ্গ মরিচে রান্ধিলেক শ্বেত সরিষার শাগ।।
নিরামিষ রান্ধিয়া করিল একভিত্য।
মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধিতে গেল চিত্ত।।
রড় বড় সওল মৎস্য রাঙ্গা হইছে কোল।
কত তৈলত ভাজে কত রান্ধে ঝোল।।
ছোট ছোট চেঙ্গ মৎস্যের ফালাইয়া মুড়।

তাহা দিয়া রান্ধিলেক নন্দন বারিব থোড়।।
বড় বড় ইচা মৎস্যের ফেলাইয়া তালু।
তাহা দিয়া রান্ধিলেক সঙ্কচুর আলু।।
বড় বড় চাইন মৎস্য দেখিতে বড় ভাল।
কত করে ভাজা ভাজা কত করে ঝোল।।
বড় [বড়] কই মৎস্য করিয়া ভাগ ভাগে।
তাহা রান্ধিল লাউ আলু কচুর লগে।।
চেঙ্গ পোড়া দিয়া রান্ধে মিঠা আমের বউল।
কলার মূল দিয়া রান্ধে পীপলিয়া সউল।।
রান্ধিতে রান্ধিতে সোনাইর কানের লড়ে সোনা।
কটু তৈল দিয়া ভাজে রাঙ্গা সৈলের পনা।।
ছোট ছোট নালি মৎস্যের ফালাইয়া মুরি।
সরূসা বাটিয়া দিয়া রান্ধিলেক ঝুরি।।
রান্ধিতে রান্ধিতে সোনাইর না পূরিল আশ।
প্যাঁকা তেতৈলে করে খেলৈর বংশ নাশ।।
মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধিয়া করে এক ভিত।
মাংসের ব্যঞ্জন রান্ধে হইয়া হরষিত।।
ধুম নিধুম রান্ধে দিয়া চৈইর ঝাল।
আখিনি পালাহু রান্ধে ঘৃতের মিশাল।।
খিড় খিড়িয়া রান্ধে দুগ্ধের পঞ্চ পিঠা।
গুড় চিনি দিয়া রান্ধে খাইতে লাগে মিঠা।।
ইষ্টমিত্র জ্ঞাতি আনিয়া সর্ব্বজন।
সকলেরে দিয়া সোনাই করিল ভোজন।।
[জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত ১৯৬২:২৯৯-৩০০]।

আমরা জানি মনসামঙ্গল বিয়োগান্ত কাব্য, আলঙ্কারিক বিচারে এর অঙ্গীরস করুণ। শাপভ্রষ্ট দেব-দেবী (কামদেব পুত্র অনিরুদ্ধ এবং বাণ কুমারী ঊষা) মনসাপূজা প্রচারের জন্যে মর্ত্যে জন্ম নিয়েছিলেন লক্ষীন্দর বেহুলা রূপে এবং শাপান্তে তারা ফিরে যান স্বর্গলোকে। কিন্তু মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের কবিরা সেই দেব-মাহাত্ম্য বর্ণনার মধ্যেও মানুষের মর্মকথনকে উপক্ষো করতে পারেন নি। ফলে যেখানেই সামান্য সুযোগ পেয়েছেন অসামান্য দক্ষতায় তাদের মর্মের সমাচার জানিয়েছেন। প্রাগুক্ত খাদ্য-তালিকা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, ফুল্লশ্রী গ্রামের কবি বিজয়গুপ্তের বর্ণনায় যে রন্ধন সামগ্রীর উল্লেখ করা হয়েছে তার সঙ্গে দেবী মনসার কোন সম্পর্ক নেই,

সম্পর্ক রয়েছে বাঙালী জীবনের। বিশেষত ভোজনবিলাসী বরিশালবাসীর শাক-সবজি নিরামিষ থেকে বিভিন্ন মাছ-মাংস-পোলাও-পিঠা কোনো কিছুর অভাব ঘটেনি কবির আয়োজনে; বিচিত্র তার মসলা, বৈচিত্র্যময় তার রন্ধন-প্রণালি, এতে কেবল সোনা বা সোনাইয়ের মনের সাধ মেটেনি-এ খাদ্যের আস্বাদনে আবহমান কালের বাঙালী-রসনাও তৃপ্ত হয় যুগপৎ। শুধু সুখের ঘরের খাদ্য-সমাচার দেননি কবি বিজয় গুপ্ত, মনসার কোপানলে দুর্দশাগ্রস্ত চাঁদ সওদাগর কেবল প্রাণে বেঁচে "উপুড় হইয়া চান্দো খালের পানি খায়" সে নিদারুণ দৃশ্যের ও বর্ণনা করেছেন নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে, কুমার বৌয়ের কাছে চার পোনে কাঠ বিক্রী করে ক্ষুধার্ত বণিক স্বপ্ন দেখে:

এক পোন দিয়া আমি ক্রিয়া শুদ্ধি করিমু।
এক পোন দিয়া আমি চিড়া কেলা খামু।।
[জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত ১৯৬২:২৯২]

পাঁচ : চণ্ডীমঙ্গল

মধ্যযুগের (১৬শ শতক) জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের বহু জায়গায় বিচিত্র ধরনের খাদ্যের দৃষ্টান্ত মেলে। কারণ " মুকুন্দ ভক্ত এবং বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি ছিল গোলক বৃন্দাবনে নয় ইহলোকে নিবদ্ধ [সুকুমার সেন ১৯৮৬:৫১]। ফলে ধনী-দরিদ্র, জমিদার-কৃষক, বণিক-ব্যাধ নানা শ্রেণির মানুষ, তাদের আচার-আচরণ, ক্রিয়া-কর্ম, স্বভাব-ধর্ম তাঁর কাব্যে সার্থক শব্দরূপ লাভ করেছে। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের তাবৎ ভোজ্য-পানীয়ের বিস্তারিত বিবরণ আমরা দিতে পারবো না, কেবল নির্বাচিত এলাকার কিছু নমুনা তুলে ধরছি প্রথমেই ব্যাধ কালকেতুর ভোজনের বিবরণ:

ঘরে হইতে ফুল্লরা বীরের পাইল সাড়া
সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণের ছড়া।
মোকা নারিকেলেতে পুরিয়া দিল জল
ঝাটজল দিয়া কৈল ভোজনের স্থল।
পাখালিল মহাবীর পদপানি মুখ
ভোজন করিতে বৈসে মনের কৌতুক।
সম্ভ্রমে ফুল্লরা পাতে মাটিআ পাথরা
বেঞ্জনের তরে দিল নৌতুন খাপরা।
মুচড়িয়া গোফ দুটা বাঁন্ধে নিঞা ঘাড়ে

একশ্বাসে তিন হাণ্ডি আমানী উজাড়ে।
চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ-জাউ
সুপ ছয় হাঁড়ি তায় মিসাইয়া লাউ।
বুড়ি দুই তিন খায় আলুওল পোড়া
সারি কচু ঘন্টে মিশা করঞ্জা আমড়া।
অন্ন খাইয়া মহাবীর জায়ারে জিজ্ঞাসে
রন্ধন কর‍্যাছ ভাল আর কিছু আছে।
আনিঞাছি হরিণ দিআ দধি এক জাড়ি
তাহা দিআ খাও বীর ভাত তিন হাঁড়ি।
শয়ন কুচ্ছিত বীরের ভোজন বিট্‌কাল
ছোট গ্রাস তোলে বীর জেন হাড়িয়া তাল।
[সুকুমার সেন ১৯৮৬:৪৫-৪৬]

আখেটিক বা ব্যাধ খণ্ডে কবি কালকেতু ফুল্লরার জীবনকে চিত্রিত করেছেন গভীর মমত্ব দিয়ে; কিন্তু তাদের প্রিয়খাদ্য কিংবা শয়ন-ভোজন প্রক্রিয়াকে মোটেই প্রশংসা করতে পারেন নি (স্মর্তব্য—' কুচ্ছিত' 'বিট্‌কাল')। এ কাব্যের বণিকখণ্ডে মুকুন্দরাম রাঢ় বাংলার মানুষের লোভনীয় খাদ্যদ্রব্যের যে তালিকা দিয়েছেন তা যে কোনো ভোজনরসিক ঐতিহাসিককে প্রলুব্ধ করার জন্যে যথেষ্ট। যেমন দুবলার খাদ্যদ্রব্য ক্রয়:

লাউ কিনে কচি কুমড়া বিশা দরে পল কড়া
পাকা আম্র কিনে শয় মূলে
কিনিঞা নবাত ফেনি বিশা দরে কিনে চিনি
পান কিনে সহস্রের দরে।
মূল্য দিয়া পণ দশ জিয়ন্ত কিনিল ঋষ
জরট কমট কিনে রুই
খরুসালা কিনে কই কিনিল মহিষা দই
কামরঙ্গ কিনে পণ দুই।
কলা চাঁপা মর্তমান সরস গুয়া মিঠাপান
কর্পূর কিনিল শঙ্খ চুন
সাক বাগান সারি কচু খাম আলু কিনে কিছু
বিশা শত আটি কিনে লোন।

নরম কিনে তালশাঁস হিঙ্গ জিরা রসবাস
চঞ্চি মেথি জোহানি মহরি
মুগমাষ বরবটী কিনিল সরল পুঁঠি
সের জুখ্যা লয় ফুলবড়ি।
রন্ধন-সন্ধান জানে পঙ্কাল চিঙ্গড়া কিনে
সৌল পোনা কিনে দুয়া চেড়ি
মানওল কিনে সারি দুগ্ধ কিনে ভার চারি
পুঞ্জি দশ কিনিল কাঁকুড়ি।
চতুর সাধুর দাসী আট কাহনে কিনে খাসী
তৈল সের দরে দেড় বুড়ি
তোলমূলে তেজপাত খির নিল বিশা সাত
আদা বিশা দরে দেড় বুড়ি।
জুড়িদরে নারিকল কুলি করঞ্জা পানিফল
কাঁঠাল কিনিল দুই কুড়ি
কিছু কিনে ফুলগাভা কবুনা কমলা টাবা
সের দরে ঘৃতে ঘড়া ভরি।
নির্মাণ করিত পিঠা বিশা দরে কিনে আটা
খণ্ড কিনে বিশা সাত আট
দুবলা বেসাত্যা জানে অবশেষে হাঁড়ি কিনে
মাগ্যা লয় তার কিছু ভাট।
কিনিঞা রন্ধনসাজ কিছু কিছু নিল ব্যাজ
হরিদ্রা চুপড়ি ভরি কিনে
স্নান করি দুবলা খায় খণ্ড দধি কলা
চিড়া দধি দেয় ভারিগণে।
[সুকুমার সেন ১৯৮৬ :১৫৮]

শুধু বাজারের সুখাদদ্রব্যের বর্ণনায় মুকুন্দরাম তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন নি, এ-যুগের পাঠককে উপহার দিয়েছেন, সুক্তা ঝোল, ঘন্ট, ঘিয়ে জবজবে মাছ-মাংসের বড়া, ভাজা কইমাছ ইত্যাদি। আর লহনার রান্না থেকে লোভসংবরণ করা সত্যি কঠিন:

রন্ধন করিতে হইল লহনার ত্বরা
ঘৃত পুর‍্যা রাখে রামা কুঁড়িয়া পাথরা।

ঘৃত জবজব রান্ধে নালিতার শাক
কটু তৈলে বাথুয়া করিল দৃঢ়পাক।
খণ্ড মুগের সুপ উভরে ডাবরে
আচ্ছাদন থালাখানি দিলেন উপরে।
কটু তৈলে রান্ধে রামা চিথলের কোল
বুহিতে কুমুড়া বড়ি আলু দিআ ঝোল।
রান্ধিল ছোলার সুপ দিআ তথি খণ্ড
অলস ত্যজিয়া জাল দিল দুই দণ্ড।
কটু তৈলে কই মৎস্য ভাজে গণ্ডা দশ
মুঠ্যে নিঙ্গড়ি তথি দিল আদারস।
বদরি শকুল মান রসাল মুসরি
পণ চারি ভাজে রামা সরল-শফরী।
কথোগুলি তোলে রামা চিঙ্গড়ির বড়া
ছোট ছোট গোটা চারি ভাজিল কুমুড়া।
পঞ্চাশ বেঞ্জন অন্ন করিল রন্ধন
থালায় ওদন বাটী ভরিআ বেঞ্জন।
[সুকুমার সেন ১৯৮৬:১৫০]

এরপর অর্থাৎ 'পঞ্চাশ বেঞ্জন-- এর পর খুল্লনার সাধভক্ষণের জন্য লহনার শাক রান্নার সমাচার পাঠককে না দিলেও ক্ষতি হবে না। তবে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলে অর্থাৎ বিজয়গুপ্ত এবং মুকুন্দরামে অঞ্চল-পার্থক্যের জন্য শাকের প্রকারে কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

ছয়:মৈমনসিংহ গীতিকা

মঙ্গলকাব্য কিংবা ধর্মকৈন্দ্রিক পদাবলিতে বাংলা কাব্যের আদি-মধ্যযুগ যেখানে প্লাবিত, সেখানে গ্রাম বাংলার অতি সাধারণ নর-নারীর প্রেম ভালোবাসা, বিরহ-বেদনা, প্রত্যাশা-প্রবঞ্চনা এবং জীবন-সংগ্রামের বিশ্বস্ত আলেখ্য অঙ্কন করেছেন মৈমনসিংহ গীতিকার লোক-কবিরা। সপ্তদশ শতাব্দের অবিস্মরণীয় এ পালাগুলোর মূল এলাকা হচ্ছে —"উত্তরে সুষঙ্গ দুর্গাপুর ও দক্ষিণে নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের অন্তবর্তী পল্লীসমূহ ....." [দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৭৩ : ভূমিকা] ফলে এ সমস্ত গীতিকা বাংলাদেশের অখ্যাত অজ্ঞাত সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা ও আচরণের বিশ্বস্ত দলিলরূপে বিবেচিত হতে পারে। আমরা এর ঐতিহাসিক বা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় না গিয়ে গ্রামের মানুষের আন্তরিক আপ্যায়নে সামান্য খাদ্যবস্তুও যে কত অসামান্য

ব্যঞ্জনা পেয়েছে, তার দু'চারটে নমুনা তুলে ধরছি। প্রথমেই *মহুয়া* পালার 'শেষ বিদায়'– এ মহুয়ার উক্তি:

আমার বাড়ীত যাইওরে বন্ধু বইতে দিয়াম পিরা।
জলপান করিতে দিয়াম সালিধানের চিরা।।
সালি ধানের চিরা দিয়াম আরও সবরী কলা।
ঘরে আছে মইষের দইরে খাইবা তিনো বেলা।।
[দীনেশ চন্দ্র সেন ১৯৭৩:১৬]।

মলুয়া পালাতে অতিথি অভ্যর্থনায়:

সন্ধ্যাকালে অতিথ আইল ভিন দেশে ঘর।
পাঁচপুত্রে ডাক্যা কয় সাধু হীরাধর।।
লোটা ভইরা শীতল জল দিল খরম পানি।
পাঁচ ভাইয়ের বউয়ে রান্ধে পরম রান্ধুনি।।
মানকচু ভাজা আর অম্বল চালিতার।
মাছের সবুয়া রান্ধে জিরার সম্বার।।
কাইট্টা লইছে কই মাছ চরচরি খারা।
ভালা কইরে রান্ধে বেনুন দিয়া কাল্যাজিরা।।
একে একে রান্ধে সব বেনুন ছত্রিশ জাতি।
শুকনা মাছ পুইড়া রান্ধে আগল বেসাতি।।
পাঁচভাইয়ের সঙ্গে বিনোদ পিড়িত-কন্যা খায়।
এমন ভোজ্ঞণ বিনোদ জন্মে নাই সে খায়।।
শুকত খাইল বেনুন খাইল আর ভাজা বরা।
পুলি পিঠা খাইল বিনোদ দুধের শিস্যায় ভরা।।
পাত পিঠা বরা পিঠা চিত চন্দ্রপুলি।
পোয়া চই খাইল কত রসে ঢলাঢলি।।
. . .
বাটা ভরা সাচি পান লং এলাচি দিয়া।
পাঁচ ভাইয়ের বৌ দিছে পান সাজাইয়া।।
[দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৭৩ : ৬০-৬১]

মলুয়া পালাতে লোককবি কেবল এসব উপাদেয় খাদ্য-পানীয়ের বর্ণনাই করেন নি, তিনি 'ভাগ্যচক্রের পরিবর্তন'— এ বিদেশ যাত্রার প্রাক্‌কালে কৃষিজীবী মানুষের আসল খাবারের চিত্র তুলে ধরেছেন সংক্ষিপ্তভাবে:

ঘরে আছিল পানিভাত বাইরা দিল মায়।
কাঁচালঙ্কা দিয়া বিনোদ কিছু কিছু খায়।।
[দীনেশ চন্দ্র সেন ১৯৭৩:৬৫]

কাজল রেখা তে লোককবি গ্রহণ করেছেন বহুকালের প্রচলিত রূপকথার কল্পিত কাহিনী। আর এ রূপকথাকে ঘিরে অপরূপ রূপ লাভ করেছে গ্রামীণ মানুষের স্বপ্নসাধ আশা-আকঙ্ক্ষার বিচিত্র সমাচার। নকল রানীর বিস্বাদ রান্নার পরদিন দাসীরূপী কাজলরেখার পালা। কবি এ অঞ্চলের প্রিয়খাদ্যের তালিকা প্রদান করেছেন, যাতে খয়ের দেওয়া সুগন্ধি পানও বাদ পড়ে নি:

ভোরেতে উঠিয়া কন্যা ভোরের সিনান করে।
শুদ্ধশান্তে যায় কন্যা রন্ধনশালার ঘরে।।
উবু কইরা বান্ধ্যা কেশ আইট্যা বসন পরে।
গাঙ্গের না পানি দিয়া ঘর মাজন করে।।
মশল্লা পিটালি লইল পাটাতে বাটিয়া।
মানকচু লইল কন্যা কাটিয়া কুটিয়া।।
জোরা কইতর রান্ধে আর মাছ নানা জাতি।
পায়েস পরমান্ন রান্ধে সুন্দর যুবতী।।
নানা জাতি পিঠা করে গন্ধে আমোদিত।
চন্দ্রপুলি করে কন্যা চন্দ্রের আকিরত।।
চই চপড়ি পোয়া সুরস রসাল।
তা দিয়া সাজাইল কন্যা সুবর্ণের থাল।।
ক্ষীরপুলি করে কন্যা ক্ষীরেতে ভরিয়া।
রসাল করিল তায় চিনির ভাজ দিয়া।।
সোনার থালে বাড়ে কন্যা চিক্কন সাইলের ভাত্।
ঘরে ছিল পাতি নেম্বু কাইট্যা দিল তাত।।
সোনার বাটীতে রাখে দধিদুগ্ধ ক্ষীর।
ঘরে মজা সবরি কলা কইরা দিল চির।।

সোনার ঝাড়ি ভইরা রাখে আচমনের পানি।
তাম্বুলে সাজায় কন্যায় সোনার বাটাখানি।।
কেওয়া খয়ার দিল কন্যা গন্ধের লাগিয়া।
রন্ধনশালা ঘরে রইল রান্ধিয়া বাড়িয়া।।
[দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৭৩ : ৩৩১-৩২]

*দেওয়ানা মদিনা*তে কবি মনসুর বয়াতি এক কৃষক রমণীর অটল বিশ্বাস এবং *প্রগাঢ় প্রেমের* প্রকাশ ঘটিয়েছেন দয়িতের প্রতীক্ষায় খাদ্যপ্রস্তুতির বর্ণনার মাধ্যমে :

আইজ আসে কাইল আসে এই না ভাবিয়া।
মদিনা সুন্দরী দিল কত রাইত গোঁয়াইয়া।।
আইজ বানায় তালের পিড়া কাইল বানায় খৈ।
ছিক্কাতে তুলিয়া রাখে গামছা-বান্ধা দৈ।।
শাইল ধানের চিড়া কত যতন করিয়া।
হাঁড়ীতে ভরিয়া রাখে ছিক্কাতে তুলিয়া।।
এই মতন খাদ্য কত মদিনা বানায়।
হায়রে পরাণের খসম ফিরা্য নাহি চায়।।
ভালা ভালা মাছ আর মোরগের ছালুন।
আইজ আইব বল্যা রাখে খসমের কারণ।
[দীনেশ চন্দ্র সেন ১৯৭৩:৩৭৭]

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের বিশাল বৈচিত্র্যময় এলাকার খাদ্যসমাচার প্রদান এ নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে আদৌ সম্ভব নয়, ফলে আমরা এখন সাতখণ্ডে প্রকাশিত প্রাচীন *পূর্ববঙ্গ গীতিকায়* (মূল কাহিনীর রচনাকাল নিশ্চিত জানা যায় না) উল্লিখিত বাঙালীর কয়েকটি প্রিয় খাবারের নাম দিয়ে ভিন্ন ধারায় প্রবেশ করবো। পূর্ব বঙ্গগীতিকার মূল অঞ্চল হচ্ছে--ময়মনসিংহ, ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফরিদপুর এবং চট্টগ্রামের অংশবিশেষ। এখানে যে খাদ্য দ্রব্যের নাম পাওয়া যাচ্ছে তার স্বাদ যেমন আমাদের জানা, তেমনি রূপও পরিচিত : হুড়ুম, চিড়া, খৈ, নারকেলের নাড়ু, ডালবড়ি, সরুচাল, কাসুন্দি, মোরব্বা-আচার, মরিচবাঁটা তরতাজা ইলিশের ঝোল, পাঁচ মশলার রুই, বোয়াল মাছের ঘন্ট, চাপলে মাছের চচ্চড়ি, ডিমভরা কইমাছের তরকারি আর পায়েস-পিঠা তো আছেই।

সাত: প্রণয়োপাখ্যান

ইউসুফ-জোলেখার রচয়িতা শাহ মুহম্মদ সগীর, ১৬ শতকের এ-প্রণয়োপাখ্যানে মিষ্ট খাদ্যের সন্ধান মেলে :

কনক কটোরা ভরি মধুমিষ্ট সুখে
জলিখা তুলিয়া দেন্ত ইসুফক মুখেঁ।
ঘৃত মধু শর্করা বহুল দুগ্ধ দধি
সুধারসে পূরিত সন্দেশ নানা বিধি।
[আহমদ শরীফ ১৯৭৭ : ২১৫]

সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ* -এর আপ্যায়নে বর্ণিত:

অন্ন এই সবেরে করাই ভোজন
যথেক সুগন্ধি অঙ্গে করিলা লেপন।
মধু ঘৃত দধি শর্করা যথেক আনিয়া
যুবতী সকলে খাইবারে দিলেক আনিয়া।
উপহার ফল যথ দিল খাইবার
আঙ্গুর খোরমা আদি বিবিধ প্রকার।
[আহমদ শরীফ ১৯৭৭ : ২৫৫]

সতের শতকের কবি আবদুল হাকিমের *লালমতি সয়ফুল মুলুক*– এ বেশকিছু ফলের উল্লেখ পাওয়া যায় :

সেই বৃন্দাবন মাঝে নানা ফল অনুপাম
আঞ্জির আঙুর সেব কিশমিশ বাদাম।
অমৃত খোরমা ইক্ষু পেপিতা কমলা
আনার আখরোট খিরণী চম্পাকলা।
গোলাব জামুন আর আনারস ফল
শ্রীফল, খরমুজা আতা নারিকেল।
[আহমদ শরীফ ১৯৭৭ : ৩৫০]

এই কবি নানা ধরনের, বিশেষত মাংসের ব্যঞ্জনের বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর কাব্যে :

উট-গাভী মৈষ মেড়া দুম্বা অজা খাসি
অন্নের সহিত মাংস রান্ধ রাশি রাশি।
গইজ গয়াল ষণ্ডা মৃগ কবুতর
খরগোস রাজহংস কুক্কুট কৈতর
দধি দুগ্ধ ঘৃত ননী নানা উপহার।
[আহমদ শরীফ ১৯৭৭ : ৩৫৬]

আঠারো শতকের কবি নওয়াজিস বিরচিত *গুলে বকাউলি* কাব্যে :

মিশ্রী কন্দ দুগ্ধ ঘৃত, তণ্ডুল সঙ্গমিশ্রিত,
সুধারস সুগন্ধি পূরণ।
দধি দুগ্ধ শর্কে ঘৃত, মিশ্রি কন্দ সুধামৃত,
বাতাসা মণ্ডের বহুছন্দ।
নানারূপে পাকোয়ান, নানান মধুর নান।
প্রচারিতে আমোদ সুগন্ধ।।
[আহমদ শরীফ ১৯৭৭ : ৩৭৫]

এ শতাব্দের কবি শুকুর মাহমুদ তাঁর *গোপী চাঁদের সন্ন্যাস* কাব্যে বর্ণনা করেছেন যোগীর খাদ্য:

আতপ চাউলের অন্ন থালেতে ভরিনু।
বার বছরকার শুকুতা নিম তাতে মিশাইনু।।
সিদ্ধা মহন্ত যোগী পান নাহি খাএ।
পানের বদলে তারা হরিতকী চাবাএ।।
[আহমদ শরীফ ১৯৭৭ : ৩৯৭]

আঠারো শতকের কবি ফকির গরীবুল্লাহ, যাঁর বিখ্যাত রচনা *সোনাভান, জঙ্গ-নামা, ইউসুফ* জোলেখা ইত্যাদি। আমরা কিছু নোতুন খাবারের সন্ধান দিবে তাঁর *রচিত সত্যপীরের পুঁথি* থেকে:

সওয়া মন আনে আটা সওয়া মন চিনি।
সওয়া মন আনে দধি আর যে বিরণী।।

পাকা কলা আটা আদি তাহাতে ডালিয়া।
ভরিলে বাসন সব হালুয়া করিয়া।।
এক হাজার পান আর যে শুপারি।
আগর চন্দন চুয়া গোলাব কস্তুরি।।
[আহমদ শরীফ ১৯৭৭ : ৪০৯]

আট : *অন্নদা মঙ্গল*

অষ্টাদশ শতাব্দের বিখ্যাত কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র *অন্নদা মঙ্গল* রচনা শেষ করেন ১৭৫২ সালে। এ-কাব্যের তৃতীয় খণ্ডে 'রন্ধন' নামে একটি বিশাল অধ্যায় যোজনা করে তিনি কেবল পদ্য রসিকের নয় খাদ্য-রসিকেরও বাসনা পূর্ণ করেছেন।এ-প্রবন্ধের পরিসমাপ্তিতে তার সামান্য অংশ উল্লেখ করছি :

হাস্যমুখী পদ্মমুখী আরম্ভিলা পাক।
শড়শড়ি খন্ট ভাজা নানামত শাক।।
ডালি রান্ধে ঘনতর ছোল অরহরে।
মুগ মাষ বরবটী বাটুলা মটরে।।
বড়াবড়ী কলামূলা নারিকেল ভাজা।
দুধথোড় ডালনা শুক্তানি ঘন্ট তাজা।
কাঁটালের বীজ রান্ধে চিনিরসে বুড়া।
তিল পিটালিতে লাউ বার্ত্তাকু কুমুড়া।।
নিরামিষ তেইশ রান্ধিলা অনায়াসে।
আরম্ভিলা বিবিধ রন্ধন মৎস্য-মাসে।।
কাতলা ভেকুট কই ঝালভাজা কোল।
সীকপোড়া ঝুরী কাঁটালের বীজে ঝোল।
ঝালঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই।
কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই।।
. . .
কষ্ঠা রান্ধি রান্ধে রুই কাতলার মুড়া।
তিত দিয়া পচা মাছে রান্ধিলেক গুড়া।।
আম্র দিয়া শৌলমাছে ঝোল চড়চড়ী।
আড়ি রান্ধে আদারসে দিয়া ফুলবড়ী।।
রুই কাতলার তৈলে রান্ধে তৈল শাক।
মাছে ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক।।

কচি ছাগ মৃগ মাংসে ঝাল ঝোল রসা।
কালিয়া দোলমা বাগা সেকচী সমসা।।
অন্নমাংস সীকভাজা কাবাব করিয়া।
রান্ধিলেন মূড়া আগে মসলা পুরিয়া।।
মোটাসরু ধান্যের তণ্ডুল তরতমে।
আসু বোরো আমন রান্ধিলা ক্রমে ক্রমে।।
দলকচু ওড়কচু ঘিকলা পাতরা।
মেঘহাসা কালামনা রায় পানিতরা।।
কালিন্দী কনকচূর ছায়াচূর পুদি।
শুয়া শালি হরিলেবু গুয়াথুবি সুঁদী।।
ঘিশালী পোয়ালবিড়া কলামোচা আর।
কৈজুড়ী খাজুরছড়ী চিনা ধলবার।।
দাদুসাহি বাঁশফুল ছিলাট করুচি।
কেলেজিরা পদ্মরাজ দুদসার লুচি।।
কাঁটারাঙ্গি কোঁচাই কপিলাভোগ রান্ধে।
ধুলে বাঁশগজাল ইন্দ্রের মন বান্ধে।।

[ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ১৩৫৭: ৩৮৬-৮৮]

চালের গন্ধে যখন দেবরাজ ইন্দ্রই বশীভূত, তখন আমাদের বিষ্ণুভোগ, গন্ধেশ্বরী, বাঁশমতী পর্যন্ত না যাওয়াই সমীচীন।।

টীকা

১। হাজার বছর আগেকার কবির 'এ শূন্য হাঁড়ির' ঘোষণা আজও গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনে সমান সত্য। এবং সেজন্যেই শতাব্দের পর শতাব্দ চলে গেলেও ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটুনী দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছিল- ধন নয়, মান নয় 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।"

গ্রন্থপঞ্জি

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্) *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।*
১৯৭৫ কলকাতা।

আহমদ শরীফ
১৯৭৭
মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ। ঢাকা।

জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত (সম্)
১৯৬২
কবি বিজয়গুপ্তের পদ্ম পুরাণ। কলকাতা।

দীনেশ চন্দ্র সেন
১৯৭৩
মৈমনসিংহ গীতিকা। কলকাতা।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও
সজনীকান্ত দাস (সম্)
১৩৫৭
ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৯৭২
রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা।

সুকুমার সেন
১৯৭৩
চর্যাগীতি-পদাবলী। বর্ধমান।

সুকুমার সেন (সম্)
১৯৮৬
কবিকঙ্কন বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল। কলকাতা।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
১৩২৩
হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা। কলকাতা।